গাড়ি বেচা কেনার যত কথা

জাপানের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার এবং বাংলাদেশের উদ্ভট নীতি

গোলাম মোর্তোজা

উচ্চবিত্ত যে জীবনযাপন করে, মধ্যবিত্ত তার স্বপ্ন দেখে। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন নিজের একটি বাড়ি হবে, জীবনে আসবে স্বাচ্ছন্দ্য...। বাড়ির স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেছে। নির্মম বাস্তবতায় বাড়ির স্থান দখল করে নিয়েছে ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গে গাড়ি- এটাও মধ্যবিত্তের স্বপ্নেরই অংশ। এই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার প্রথম মিল হয় বছর দশেক আগে। তৎকালীন খালেদা জিয়া সরকার তাদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেয়। কমানো হয় জাপান থেকে আমদানি করা রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্ক। '৯৫ সালে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকায় একটি স্টেশন ওয়াগন গাড়ি কেনা যেত। তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে কেনা যেত টয়োটার বিভিন্ন মডেলের গাড়ি। অনেক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণ হয় এই সময়ে।

'৯৬ সালে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা সরকার। এই সময়কালে বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বদলে যায় ২০০১ সালে পুনরায় খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর। ২০০২-০৩ সালে বাজেটে নিরুৎসাহিত করা হয় রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি।

১৬০০ সিসির উপরের রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেসব গাড়ি ব্যবহৃত হয় যেমন পিকআপ, মাইক্রোবাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে শুল্ক ছিল অনেক কম। এই সুবিধা বাতিল করা হয়। আমদানি করা যাবে এ রকম সব রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্ক বাড়ানো হয়। কমানো হয় নতুন গাড়ির শুল্ক।

গাড়ি আবার পরিণত হয় উচ্চবিত্তের বিলাস সামগ্রীতে। গাড়ি চলে যায় মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিন লাখ টাকার গাড়ির দাম হয়ে যায় ৭-৮ লাখ টাকা, যা ক্রমেই বাড়ছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ নির্বিশেষে পৃথিবীতে প্রায় ১৬০টি দেশ জাপানি রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি করে। জাপানেও ১৫ হতে ২০ বছরের পুরাতন/রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে। জাপানি রিকন্ডিশন্ড মোটর গাড়ি পরিবেশ সহায়ক হিসেবে স্বীকৃত। প্রকৃত অর্থে জাপানিরা যেমন পরিবেশ বিষয়ে সচেতন, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরি প্রতিটি পেট্রোল গাড়িতে নির্মাণকালে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার আর ডিজেল গাড়িতে ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযুক্ত থাকে। তাছাড়া প্রযুক্তির আধুনিকতম উদ্ভাবন হিসেবে এসব গাড়িতে সংযোজন হচ্ছে ভিভিটিআই, হাইব্রিড ও ইএফআই ইঞ্জিন। অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য তৈরি গাড়ি কয়েক বছর ব্যবহারের পর রিকন্ডিশন্ড হিসেবে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও আমদানি হয়ে থাকে।

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে কিছু যুক্তি দেখানো হয়েছিল। এর মধ্যে একটি যুক্তি ছিল পরিবেশ দূষণ। আমাদের রাজনীতিবিদরা তখন বলেছিলেন, রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশ দূষণ করে। আরেকটি অভিযোগ ছিল, জাপানে অ্যাক্সিডেন্ট করা অতি পুরনো গাড়ি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার যুক্তির পেছনে এ রকম আরো কিছু কারণের কথা বলা হয়েছিল।

পরিবেশ দূষণের এই বিষয়টি নিয়ে ‘সোসাইটি ফর আরবান এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন’ বিশ্বব্যাংক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ু মান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহায়তায় একটি জরিপ করেছিল। জরিপে দেখা যায়, সদ্য আমদানিকৃত নতুন ভারতীয় মারুতি, সুজুকি জেন এবং টাটা ইন্ডিকা গাড়ির দূষণমাত্রা অনেক বেশি। যেখানে ভয়াবহ কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ অন্য যেকোনো গাড়ির তুলনায় কয়েকগুণ। ১০০টি রিকন্ডিশন্ড গাড়িতে পরিচালিত জরিপে সেগুলোয় ক্যাটালাইটিক কনভার্টারসহ উন্নত প্রযুক্তির ইঞ্জিন পাওয়া যায়। এগুলোর দূষণমাত্রাও ভারতীয় নতুন গাড়ির চেয়ে কয়েকগুণ কম বলে প্রমাণিত হয়।

পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, রিকন্ডিশন্ড ও জাপানি গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার সংযুক্ত থাকলেও ৯টি ভারতীয় গাড়ির একটিতেও তা নেই। ভারতীয় নতুন যে সব গাড়িতে দূষণমাত্রা পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে ঢাকা মেট্রো-প-১৪-১৫৯২ রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ৮০০ সিসির মারুতি ট্যাক্সি ক্যাবের নির্মাণ সাল ছিল ২০০২। কার্বুরেটর সংযুক্ত ইঞ্জিনের এই গাড়ির কার্বন মনোক্সাইড নির্গতের হার ছিল ৬.৯১% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ ছিল ৪৭৪ পিপিএম। একই মডেল ও একই সালে তৈরি ঢাকা-প-১৪-১৮৬৮ নম্বরের অপর মারুতি ক্যাবে ৭.৩৫% কার্বন মনোক্সাইড ও ৯৮০ পিপিএম হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালে তৈরি ১ হাজার সিসির সুজুকি জেন-এ পাওয়া যায় ১০.৩৫% কার্বন মনোক্সাইড ও ৯৮৮ পিপিএম হাইড্রোকার্বন। এই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর হচ্ছে ঢাকা মেট্রো-প-১১-০২৮৭। ২০০১ সালে তৈরি একই মডেলের অপর একটি গাড়ি যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-প-১৪-০৬৭৯ তাতে প্রাপ্ত কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ ছিল ১.৪৪% ও হাইড্রোকার্বনের ৪৫০ পিপিএম। ঢাকা মেট্রো-প-১৪-০৬৬৭ নম্বরের মারুতি ৮০০ সিসি যা ২০০২ সালে তৈরি সেটির কার্বন মনোক্সাইড নির্গতের হার ছিল ১২.৩৩% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ পাওয়া যায় ১৪৩০ পিপিএম। ২০০২ সালের ১ হাজার সিসির টাটা ইন্ডিকা ক্যাব যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো-প-১৪-০১০১ তা থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইডের হার ছিল ৮.১৮% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ পাওয়া যায় ৬৪২ পিপিএম। ৭.৬২% কার্বন মনোক্সাইড ও ৭২১ পিপিএম হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় ঢাকা মেট্রো-প-১১-২০৬১ নম্বরের অপর একটি টাটা ইন্ডিকায়। ২০০২ সালে তৈরি ঢাকা মেট্রো-প-১১-১১৮৮ নম্বরের মারুতি ৮০০ সিসি থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইডের হার ছির ৬.৪৮% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ ছিল ২৭০ পিপিএম।

‘আশা করছি সরকার এবার বিষয়গুলো বিবেচনা করবে’

আবদুল মান্নান চৌধুরী খসরু

mfvcwZ, evi wfWv

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাজেট তো প্রায় চলে এলো। আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?

আবদুল মান্নান চৌধুরী খসরু : আমরা রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রেস কনফারেন্স করেছি। এ ছাড়া লিখিতভাবে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেছি। আশা করছি সরকার এবার বিষয়গুলো বিবেচনা করবে।

২০০০ : আপনাদের প্রস্তাবগুলোতে কোন দিকটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে?

খসরু : আমরা গাড়ি আমদানি নীতিমালার কিছু পরিবর্তন চাচ্ছি। সর্বোচ্চ ৪ বছরের পুরনো গাড়ি আমদানির সীমাবদ্ধতা যৌক্তিক নয়। কেননা, এতে করে অধিক ব্যবহৃত গাড়ি ক্রয় করতে হয় আমাদের। এ সময়সীমা বাড়ানো উচিত। এ ছাড়া শুল্কায়ন পদ্ধতির সংস্কারও জরুরি। আমি মনে করি জাপান অটো অ্যাপরাইসেল ইনস্টিটিউট (জেএএআই) থেকে প্রকাশিত ‘ইয়েলো বুক’-এ প্রদত্ত মূল্যের ওপর শুল্কায়ন করা উচিত।

২০০০ : ‘ইয়েলো বুক’ কতটা বিশ্বস্ত এবং কার্যকর বলে মনে করেন আপনি?

খসরু : শুধু আমি কেন, সারা বিশ্বই এই বইটিকে বিশ্বাস করে। এতে কোনো অসততার সুযোগ নেই। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশ এই বই অনুসরণ করে।

২০০০ : আমাদের দেশ কেন অনুসরণ করে না?

খসরু : আমাদের দেশও করে। সরকার এ বইয়ের বিশ্বস্ততা মেনে নিয়েছে কিন্তু তারা এখান থেকে আংশিক অনুসরণ করে। এ বই থেকে গাড়ির নতুন অবস্থার মূল্যটা নেয়। তারপর এক বছরের পুরনো হলে ১০% এবং ২ বছরের হলে ১৫% অবচয় প্রদান করে। অথচ এই বইতে বর্তমান অবস্থায় গাড়ির দাম কতো তা দেয়া আছে। আমাদের দাবি, সরকার আংশিক না করে পুরোটা অনুসরণ করুক।

২০০০ : সরকার কেন রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে এসব সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দিচ্ছে?

খসরু : এটা করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এ সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী নতুন গাড়ির ব্যবসা রমরমা করার জন্য এসব করেছে।

২০০০ : এতে করে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

খসরু : আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রেতা-সাধারণ। রিকন্ডিশন্ড গাড়ির অধিকাংশ ক্রেতাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অতিরিক্ত শুল্কায়নের ফলে সবাইকে অনেক বেশি দামে গাড়ি ক্রয় করতে হয়।

২০০০ : অধিক শুল্ক তো সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আপনার কি মনে হয়?

খসরু : শুল্ক হার কমলে গাড়ির আমদানি বাড়বে। আর গাড়ির আমদানি বাড়লে রাজস্বও বাড়বে। তাই আমি মনে করি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য শুল্ক হার বৃদ্ধি করতে হয় না।

২০০০ : অনেকেই বলছেন রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশ বান্ধব নয়।

খসরু : এটা আসলে অযৌক্তিক কথা। এসব গাড়ি আসে জাপান থেকে এবং এগুলো জাপানিদের জন্য তৈরি করা। তাই এগুলো পরিবেশ-সহায়ক করেই তৈরি করা হয়। বরং নতুন গাড়ির নামে দেশে ইন্ডিয়ান গাড়ির ডাম্পিং তৈরি হয়েছে।

২০০০ : বাজেটে আপনাদের দাবির কতটা প্রতিফলন ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

খসরু : রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা আশাবাদী।

জরিপে পুরাতন/রিকন্ডিশন্ড হলেও জাপানের তৈরি বিভিন্ন মডেলের গাড়িতে প্রাপ্ত দূষণের মাত্রা ছিল অনেক কম। ঢাকা মেট্রো-১৩-৩৬৩৭ নম্বরের একটি ১৫০০ সিসির টয়োটা গাড়িতে প্রাপ্ত কার্বন মনোক্সাইডের হার ছিল মাত্র ০.০২% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ ছিল ৩৬ পিপিএম। এই গাড়িটি তৈরির সাল ১৯৯৩। ১৯৯৭ সালে তৈরি ১৫০০ সিসির অপর একটি টয়োটা গাড়ি থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ পাওয়া যায় যথাক্রমে ০.২২% ও ১৭৪ পিপিএম। এমনকি ১৯৯১ সালে তৈরি ৩ হাজার সিসির একটি টয়োটা গাড়িতে প্রাপ্ত কার্বন মনোক্সাইডের হার ছিল ০.০২% ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ ৯৮ পিপিএম। জরিপে এ জাতীয় ১০০ গাড়ির কোনোটিতেও ভারতীয় নতুন গাড়ির মতো ভয়াবহ দূষণ পাওয়া যায়নি।

এতো গেল পরিবেশ দূষণের বিষয়। এবার দেখা যাক অ্যাক্সিডেন্ট করা অতি নিম্নমানের পুরনো গাড়ি রিকন্ডিশন্ড নামে আসে- এই অভিযোগের

ভিত্তিটা কী? এই অভিযোগের উত্তর পাওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে জাপানের রিকন্ডিশন্ড বাজারের অবস্থা কেমন? কোন গাড়িগুলোকে রিকন্ডিশন্ড বলা হয়? এই গাড়ি কিভাবে বেচা-কেনা হয়? কারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত... ইত্যাদি বিষয়।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গাড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করে জাপান। জাপানিরা একটি গাড়ি খুব বেশিদিন ব্যবহার করে না। এমন কি মাত্র এক বছর ব্যবহার করেও তারা গাড়ি পরিবর্তন করে। অর্থাৎ আগের গাড়ির পরিবর্তে নতুন মডেলের গাড়ি কিনে নেয়। তখন আগের গাড়িটি 'ইউজড কার', বা রিকন্ডিশন্ড হয়ে বিভিন্ন দেশে চলে যায়।

এই প্রক্রিয়াটি আরো স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন। ধরা যাক, সরাসরি টয়োটা কোম্পানি থেকে অথবা টয়োটার কোনো এজেন্টের কাছ থেকে একজন জাপানিজ একটি গাড়ি কিনলেন। গাড়ি একবারে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেও কেনা যায় আবার ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিস্তিতেও কেনা যায়। জাপানিজরা সাধারণত কিস্তিতে গাড়ি কিনে থাকে। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। ৩ বছর, ৫ বছর বা আরো বেশি সময়ে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এক বছর বা দুই বছর পরে টয়োটা ওই গাড়ির মডেল পরিবর্তন করে। আরো আকর্ষণীয় করে নতুন মডেলের গাড়ি বাজারে নিয়ে আসে। এক বা দুই বছর আগে পুরনো মডেলের গাড়ি যিনি ব্যবহার করছিলেন তাকে নতুন প্রস্তাব দেয় টয়োটা কোম্পানি। প্রস্তাবটি থাকে এমন যে, আপনি আগে যে পরিমাণ কিস্তির অর্থ পরিশোধ করছিলেন তার সঙ্গে যদি আরো কিছু অর্থ যোগ করেন, তাহলে নতুন মডেলের গাড়িটি পেতে পারেন। হয়তো আগে তাকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার ইয়েন পরিশোধ করতে হতো, নতুন গাড়ি নেয়ায় তাকে পরিশোধ করতে হবে ৩৫ বা ৪০ হাজার ইয়েন। কোনো ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে না। পুরনো গাড়িটি টয়োটা কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হবে। সেই পুরনো গাড়িটি টয়োটা কোম্পানি নিয়ে নেয়, সেটা আবার তারা বিক্রি করে অকশনে। ব্যবসায়ীরা এসব অকশন থেকে গাড়ি কেনে। এগুলোই ইউজড কার বা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি। রপ্তানি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এর মধ্যে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশ যেমন আছে তেমনি আছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশও।

> 'জাপানে যত রকমের গাড়ি তৈরি হয়, লোকাল মার্কেটের গাড়ি সবচেয়ে মানসম্পন্ন। লোকাল মার্কেটের প্রতিটি গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার সংযুক্ত করা হয়, যার ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না'
> **হাকিম মুহম্মদ নাসিরুল,** স্বত্বাধিকারী, হাট কোং লিমিটেড

গত নবেম্বরে টোকিওর এ রকম একটি অকশনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অকশনের স্থানটি ছিল টোকিও শহর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে।

অকশনে যারা অংশ নেবে, নির্দিষ্ট ফি দিয়ে তাদের সদস্য হতে হয়। দু-তিন দিন আগেই অকশনের সবগুলো গাড়ির খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে কাগজপত্র পৌঁছে যায় সদস্যদের কাছে। যেকোনো জায়গা থেকে অনলাইনেও অকশনে অংশ নেয়া হয়। আবার সরাসরি অকশনস্থলে গিয়েও গাড়ি কেনা যায়। যে অকশনটিতে গিয়েছিলাম সেখানে গাড়ির সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। সরেজমিন গাড়ি নয় বিশাল স্ক্রিনে গাড়ির ছবি দেখে কিনতে হয়।

জাপানের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এখন জাপানে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা। টোকিওতেই রিকন্ডিশন্ড গাড়ির নানাবিধ দিক নিয়ে কথা হয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এই ব্যবসায়ীদের সংগঠনের নাম 'জাপান বিজনেস ফোরাম'। এদের অনেকেরই টোকিওতে নিজস্ব অফিস এবং গ্যারেজ আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চার-পাঁচজন বাংলাদেশী কাজ করছে। এনকে ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী এমডি এস ইসলাম। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি বিষয়ে তিনি বললেন, 'আমরা সারা পৃথিবীর মার্কেটে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পাঠাচ্ছি, কিন্তু নিজের দেশে পাঠাতে পারছি না। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে যেখানে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির চাহিদা বাড়ছে বাংলাদেশ সেখানে অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে উদ্ভট নীতি প্রবর্তন করেছে।'

> 'নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে যেখানে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির চাহিদা বাড়ছে বাংলাদেশ সেখানে অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে উদ্ভট নীতি প্রবর্তন করেছে'
> **এমডি এস ইসলাম,** স্বত্বাধিকারী, এনকে ইন্টারন্যাশনাল

যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সাবের সাকুরা, হাকিম মুহম্মদ নাসিরুল, জহিরুল হক, এসএম রিয়াজ, শেখ মোঃ বাদল, সরকার এ বাশার, আলতাফ হোসেন খোকন, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, বাবু সরকার প্রমুখ। এদের সবারই আলাদা আলাদা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

হাট কোং লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী হাকিম মুহম্মদ নাসিরুল বললেন, 'যে গাড়ি জাপানের লোকাল মার্কেটের জন্যে তৈরি হয়, সেগুলোই এক-দুই বা তিন-চার বছর পর পরিণত হয় রিকন্ডিশন্ড গাড়িতে। জাপানে যত রকমের গাড়ি তৈরি হয়, লোকাল মার্কেটের গাড়ি সবচেয়ে মানসম্পন্ন। লোকাল মার্কেটের প্রতিটি গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার সংযুক্ত করা হয়, যার ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার খুব এক্সপেনসিভ। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার না থাকলে দাম প্রায় এক লাখ টাকা কমে যায়। ভারতীয় কোনো নতুন গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার সংযুক্ত থাকে না। জাপান থেকে এখন যে নতুন গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে, সেগুলোতেও ক্যাটালাইটিক

> 'বাংলাদেশে এখন যেসব নতুন গাড়ি আমদানি হয়, তার সব কিন্তু সরাসরি জাপান থেকে যায় না। টয়োটার থাইল্যান্ডে যে ফ্যাক্টরি আছে সেখান থেকে যায়। এসব গাড়ির মানে অনেক আপোস করা হয়'
> **সাবের সাকুরা,** স্বত্বাধিকারী, বিজে ইন্টারন্যাশনাল

> 'এখন জাপানিজরা নিজেরাই চার-পাঁচ এমনকি সাত আট বছরও গাড়ি ব্যবহার করেন। সেখানে বাংলাদেশে চার বছরের বেশি সময়ের গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করার দাবি মোটেই যৌক্তিক নয়'
> **মাহবুবল হক,** স্বত্বাধিকারী, ডায়মন্ড ট্রেডিং কোম্পানি

কনভার্টার সংযুক্ত নেই। মূলত দাম কমানোর জন্যে এটা করা হয়। জাপানিরা পরিবেশের ব্যাপারে খুবই সচেতন। তারা কোনো আপোস করে না নিজের দেশের ক্ষেত্রে।'

বিজে ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী সাবের সাকুরা বলেন, 'বাংলাদেশে এখন যেসব নতুন গাড়ি আমদানি হয়, তার সব কিন্তু সরাসরি জাপান থেকে যায় না। টয়োটার থাইল্যান্ডে যে ফ্যাক্টরি আছে সেখান থেকে যায়। এসব গাড়ির মানে অনেক আপোস করা হয়'।

টোকিও'র ডায়মন্ড ট্রেডিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মাহবুবল হক। তিনি এখন গাড়ি ব্যবসার সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, 'আগে এক বা দুই বছর পর প্রায় সব জাপানিজই গাড়ির মডেল পরিবর্তন করতেন। এখন জাপানিজরা নিজেরাই চার-পাঁচ এমনকি সাত আট বছরও গাড়ি ব্যবহার করেন। সেখানে বাংলাদেশে চার বছরের বেশি সময়ের গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করার দাবি মোটেই যৌক্তিক নয়। অ্যাক্সিডেন্ট না করলে দশ বারো বছরেও জাপানি গাড়ির কিছু হয় না। জাপানের বিশ বছরের পুরনো গাড়িও ভারতের নতুন গাড়ির চেয়ে ভালো।'

বলা হয় বাংলাদেশে এখন কোনো রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আসে না। বিষয়টি অনেকটা সত্যও।

এ বিষয়ে জাপানের রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, 'বাংলাদেশে চার বছরের বেশি পুরনো গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ। জাপানের লোকাল মার্কেটের জন্যে তৈরি হওয়া গাড়ি চার পাঁচ বছরে চলে ২০ থেকে ৪০ হাজার কিলোমিটার। ব্যবহার হয় বিশুদ্ধ তেল। অসম্ভব সুন্দর রাস্তা। ইঞ্জিনসহ গাড়ির যন্ত্রাংশের কোনো ক্ষতি হয় না। গাড়ি একদম নতুনের মতোই থাকে। এগুলোকে বলা হয় ইউজড কার। যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে রিকন্ডিশন্ড করার প্রয়োজন পড়ে না। যদি দশ বারো বছরের পুরনো গাড়ি আমদানির সুযোগ থাকতো, তাহলে রিকন্ডিশন্ড করার প্রয়োজন হতো।'

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির আমদানি কম, রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার

২/৩ বছর আগে যে গাড়ির দাম ছিল ৫-৯ লাখ টাকা বর্তমানে তার দাম ৯-১৩ লাখ টাকা। সরকারের কাছের লোকের পকেট ভারী করতে গিয়ে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির এই মূল্যবৃদ্ধি। ২০০২-০৩ অর্থবছরের বাজেটে যে শুল্ক বৈষম্য ছিল তার দূর করা হয় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে। কিন্তু উভয় প্রকার শুল্ক বাড়িয়ে করা হয় ৭৪%। আমদানিকারকদের কোনো দাবি-দাওয়া পূরণ করা হয়নি। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে কোনো অবচয় দেয়া হয়নি। পরের বছর ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে অবচয় চালু করা হয়। কিন্তু ১ বছরের পুরনো গাড়িতে ১০% এবং ২-৪ বছরের পুরনো গাড়িতে ১৫% অবচয় প্রদান করা হয়। যা ব্যবসায়ীদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি এবং এটা আন্তর্জাতিক বিধিসম্মত নয়। তাই ব্যবসায়ীরা এখন অবচয় চায় না। তারা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটকে সামনে রেখে তাই নতুন প্রস্তাব পেশ করেছে। সারা বিশ্বেই পরিবর্তিত মূল্যের ওপর ভিত্তি করে শুল্কমূল্য ধার্য করা হয়। অথচ WTO-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখনো এটা কার্যকর করতে পারেনি। ২০০০ সালে যে গাড়ির শুল্ক করের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৫১ হাজার টাকা, সে গাড়ি বিক্রি হতো ৫ লাখ টাকায়। আর বর্তমানে সেই একই গাড়ির শুল্ককরের পরিমাণ ৪ লাখ ২৭ হাজার টাকা, যার বিক্রি মূল্য ৯ লাখ টাকা।

২০০৪ সালের জুন মাসে ১ ডলারের বিনিময় হার ছিল ৫৮ টাকা। বর্তমানে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ টাকায়। অন্যদিকে ১ ডলারের জাপানে বিনিময় হার ছিল ১৩০ ইয়েন যা বর্তমানে ১০২-১০৮ ইয়েন। আমদানিকালে ঋণপত্র খোলা হয় ডলারে। জাপানে এটি বিনিময় হয় স্থানীয় মুদ্রা ইয়েনের সঙ্গে। ইয়েন এবং ডলারের মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কাস্টম হাউজে মূল্য নির্ধারণ (অ্যাসেসমেন্ট) পর্যায়ে শুল্কায়ন মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শুল্ককারও বেড়ে চলছে। লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি মুদ্রা বিনিময় হারের পাশাপাশি রিকন্ডিশন্ড গাড়ির প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাব রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে তৈরি করছে প্রতিবন্ধকতা। এতে করে গাড়ি আমদানি কমে যাওয়ার ফলে বড় রকমের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। রিকন্ডিশন্ড গাড়ির আমদানি কতটা গতিশীল থাকবে তা এখন নির্ভর করছে আসছে বাজেটের ওপর। তবে সবাই আশা করছে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব ভূমিকা রাখবে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে।

অ্যাক্সিডেন্ট করা, অকেজো নিম্নমানের গাড়ি কিনে সেগুলোকে রিকন্ডিশন্ড করে বাংলাদেশে পাঠানো হয় বলে যে অভিযোগ করা হয়, অনুসন্ধানে দেখেছি, তার কোনো ভিত্তি নেই। এ রকম গাড়ি পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ জাপান থেকে রিকন্ডিশন্ড বা ইউজড কার আমদানি করতে হলে জেএএআই- জাপান অটো অ্যাপ্রাইজাল ইনস্টিটিউটের সনদপত্র নিতে হয়। প্রতিটি গাড়ির বয়স, মডেল, চেসিস নং সবকিছু প্রত্যয়ন করে তারা সার্টিফিকেট দেয়। তারপরই গাড়ি রপ্তানি করা যায়। এখানে কাগজপত্রে গরমিল করার কোনো রকম সুযোগ নেই। গাড়ি এক রকম আর কাগজে অন্যরকম দেখানো হবে- এটা করা অসম্ভব।

ভারত থেকে নতুন গাড়ির পাশাপাশি অনেক নিম্নমানের পুরনো গাড়িও আমদানি হচ্ছে। এগুলো আমদানি হচ্ছে মূলত বেনাপোল বন্দর দিয়ে। এখানে ঘটছে নানা রকমের দুর্নীতি। এখানে মান দেখার কেউ নেই। সবকিছুই হয় অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে। মাল বোঝাই করে যে সব ট্রাক বাংলাদেশে ঢুকছে সেগুলোর মাল খালাস করে ফিরে যাওয়ার কথা। কাগজে ফিরে যাওয়া দেখানো হলেও অনেকগুলো থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশে। যে গাড়িগুলো মোটেই মানসম্পন্ন নয়। এই গাড়িগুলোর সঙ্গে জাপানি গাড়ি মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে। বলার চেষ্টা করা হচ্ছে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশ দূষণ করছে যা মোটেই সত্যি নয়।

বাংলাদেশে গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে জনস্বার্থে একটি নীতি থাকা প্রয়োজন। যে নীতিতে উপকৃত হবে দেশ, দেশের মানুষ। নতুন গাড়ি বাংলাদেশে আমদানি হবে- এটা নিয়ে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। যারা নতুন গাড়ি কিনতে চান তারা অবশ্যই কিনবেন। পাশাপাশি রিকন্ডিশন্ড বা ইউজড কারের ক্ষেত্রেও যৌক্তিক নীতিমালা প্রয়োজন। অল্প কিছু মানুষকে এমন সুযোগ করে দেয়া উচিত নয়, যাতে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। নিম্নমানের, পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর এমন গাড়ি সেটা নতুন বা পুরনো যাই হোক না কেন, তার বিপক্ষে কঠোর সিদ্ধান্তই নেয়া উচিত। সিদ্ধান্তটি নিতে হবে সততা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সততা এবং স্বচ্ছতার বড় অভাব। শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার বৈষম্যের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে 'টয়োটা এন জেড ই ১২১' মডেলের ১৫০০ সিসির গাড়ির কথা বলা যায়। জাপানি ইয়েলো বুক অনুযায়ী এ মডেলের নতুন একটি গাড়ির জাপানে ট্যাক্সসহ খুচরা বিক্রয় মূল্য ১৫ লাখ ২৮ হাজার ইয়েন। রফতানির ক্ষেত্রে (এফওবি মূল্য) ৩৫% বাদ দেয়ার পর সেটির মূল্য দাঁড়ায় ৯ লাখ ৯৩ হাজার ২০০ ইয়েন। অন্যদিকে ২ বছরের পুরনো রিকন্ডিশন্ড ঐ একই গাড়ির এফওবি মূল্য

সবচেয়ে এগিয়ে টয়োটা

'জাপানি গাড়ি খারাপ'- বর্তমান বিশ্বে এমন কথা বলার সাহস তেমন কেউই করে না। আর জাপানি গাড়ি মানেই টয়োটা। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের দিক থেকে টয়োটা শুধু জাপানেই নয়, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটি শীর্ষস্থানীয় কার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে এর ফ্যাক্টরি রয়েছে এবং এসব ফ্যাক্টরিতে বর্তমানে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার লোক কাজ করছে। এ বছরের মার্চ পর্যন্ত টয়োটার ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ১৪৩ বিলিয়ন ডলার।

গত অর্থবছরে এ কোম্পানি সারা বিশ্বে ৬ মিলিয়ন ইউনিট গাড়ি রিলিজ দিয়েছে। বর্তমানে তারা চিন্তা করছে গ্লোবাল মার্কেট শেয়ার বাড়িয়ে ১৫% করার। গত বছর টয়োটার গ্লোবাল মার্কেট শেয়ার ছিলো ১১%। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানটির এই শক্ত অবস্থান অ্যামেরিকার ফোর্ড মোটর কিংবা জিএমকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি শুরুই করেছিল বেশ শক্তভাবে। বিগত বছরগুলোতে টয়োটার বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৫০%। গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথম জাপানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউএস ডলার নিট প্রফিট করেছে। এর বর্তমান অপারেটিং ইনকাম মার্জিন ৯.৬%। তুলনামূলকভাবে জিএমের ক্ষেত্রে এটি ৭.৫% এবং ফোর্ডের ক্ষেত্রে ৬.৩%।

প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় টয়োটাকে বেশ শক্তভাবে তার কার্যক্রম চালাতে হয়। টয়োটার 'ক্রমাগত উন্নয়ননীতি বিশ্বব্যাপী একে বিশ্বস্ত করে তুলেছে। তাছাড়া তাদের কারে ডিফেক্টসের পরিমাণ অন্য কার নির্মাতাদের তুলনায় বেশ কম। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন লেভেলের ইউজারকে টার্গেট করে মার্কেটে নিত্য নতুন মডেলের কার ছাড়ে।

টয়োটা বর্তমানে গাড়ির বিকল্প ফুয়েল টেকনোলজি নিয়ে বেশ খানিকটা গবেষণা চালাচ্ছে। ২০২০ সাল নাগাদ এ কোম্পানি প্রতি বছর ১০.১ মিলিয়ন ইউনিট গাড়ি বাজারজাত করবে। এর মধ্যে ২ মিলিয়ন হবে হাইব্রিড কার এবং ১ মিলিয়ন হবে ফুয়েল সেল বেজড কার। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে জাপানের বাইরে চীনেও হাইব্রিড গাড়ি নিয়ে কাজ করছে। এখান থেকে নতুন হাইব্রিড ব্র্যান্ড প্রিয়াসে (Prius) বাজারজাত করবে। চীন সরকারের 'পরিবেশবান্ধব গাড়ি' নীতিকে সমর্থন করে টয়োটা তাদের এ কার্যক্রম শুরু করে।

অনেকে মনে করছেন, টয়োটা'র অ্যাম্বিশন দিনে দিনে অত্যধিক উপরের দিকে যাচ্ছে। আগামী বছরগুলোর জন্য ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিকল্পনা করে ফেলেছে। গ্লোবাল স্রোতের উল্টোদিকে সাতরানোই যেন এর নীতি। যেখানে অন্যান্য কার নির্মাতারা খরচ কমানোর চিন্তা করছেন, সেখানে টয়োটা আরো বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। শীঘ্রই তারা প্রতি বছরের প্রোডাকশন আরো তিন মিলিয়ন ইউনিট বাড়াবে। এজন্য তারা আরো ১৮ টি বা তারও বেশি ফ্যাক্টরি স্থাপন করছে এবং আরো ৪০ হাজার লোক নিয়োগ করছে।

গ্লোবাল মার্কেটে টয়োটার অবস্থান আরো সুসংহত করতে গত ২০০৩ সালের মাঝামাঝি সময় তারা একটি গ্লোবাল প্রোডাকশন সেন্টার তৈরি করে। সেন্ট্রাল জাপানের টয়োটা সিটিতে অবস্থিত এ সেন্টারে বিদেশী এবং দেশী স্টাফদের ট্রেনিং দেয়া হয়। ইতিমধ্যে এ সেন্টার থেকে ২০০০ লোককে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর ৮০০ লোককে এ সেন্টারে এনে ট্রেনিং দেয়া হয়।

সবকিছু মিলিয়ে টয়োটা এগিয়ে চলছে দুরন্ত গতিতে। কম দামে নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি পেতে হলে টয়োটার বিকল্প নেই। আর এই নির্মাতার গাড়িগুলোর দীর্ঘস্থায়িত্ব অনেক বেশি। পাশাপাশি জাপানি টয়োটা গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশও বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য। সবকিছু মিলিয়ে তাই দিনে দিনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে টয়োটা।

আরাফাতুল ইসলাম

হচ্ছে ৭ লাখ ৮৫ হাজার ইয়েন অর্থাৎ ৫ হাজার ৯০০ ডলার। ফ্রেইট চার্জসহ বাংলাদেশে আসার পর সেই গাড়ির মূল্য (সিএন্ডএফ প্রাইস) দাঁড়ায় ৬ হাজার ৪০০ ডলার বা ৩ লাখ ৭১ হাজার টাকা। পূর্বে এ মূল্যকে শুল্কমূল্য ধরে শুল্কায়ন করা ছাড়াও অবচয় সুবিধা দেয়া হতো। এ ক্ষেত্রে ১ বছরের পুরনো গাড়ি হলে শুল্ক ছাড় দেয়া হতো ২০%। দু'বছরের পুরনো গাড়ির জন্য ছাড় দেয়া হতো ৩২.৫%। তিন বছরের পুরনো গাড়ির জন্য দেয়া হতো ৪৫% ও ৪ বছরের পুরনো গাড়ির জন্য ছাড় দেয়ার হার ছিল ৫০%। কিন্তু চলতি কাঠামোয় রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্কমূল্যও ধরা হচ্ছে নতুন গাড়ির এফওবি মূল্য হারে। অর্থাৎ উল্লিখিত রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্কমূল্য ধরা হচ্ছে ৯ লাখ ৯৩ হাজার ২০০ ইয়েন অর্থাৎ ৮ হাজার ২৭৬ ডলারের সঙ্গে ফ্রেইট চার্জ ৫০০ ডলার যোগ করে ৮ হাজার ৭৭৬ ডলার। বাংলাদেশী টাকায় যা দাঁড়ায় ৫ লাখ ৯ হাজার ৮ টাকা। এ ক্ষেত্রে একই শুল্কমূল্যে যেখানে ৫৯% ট্যাক্সসহ একজন ব্যবসায়ী নতুন গাড়ির জন্য খরচ করেছে ৮ লাখ ৯ হাজার ৩০০ টাকা। সেখানে রিকন্ডিশন্ড গাড়িতে অতিরিক্ত ১৫% সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স যোগ করে খরচ ধরা হচ্ছে ৯ লাখ ৩০ হাজার ৭০০ টাকা।

সরকারি গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে এই জায়গাটিতে বড় রকমের অনিয়ম হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার প্রায় সাড়ে ৪০০ গাড়ি কিনেছে। কাগজে-কলমে গাড়িগুলোকে দেখানো হয়েছে ২০০৪ সালের মডেল। অথচ ঐ গাড়ি কোম্পানির ক্যাটালগ থেকে জানা যায় ১৯৯৯ সালের পর আর ঐ মডেলের গাড়ি তৈরি হয়নি। যে গাড়িটি ২০০৪ সালের মডেল হিসেবে কেনা হয়েছে ৩১ হাজার ডলার দিয়ে, '৯৯ সালের মডেলের ঐ গাড়ি মাত্র ১১ হাজার ডলারে কেনা সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রভাবশালী আমদানিকারক ঐ কোম্পানির সরাসরি এজেন্ট নয়। কোম্পানির এজেন্ট টোকিও'র 'ওরিয়েন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড'। ওরিয়েন্টের চারজন পরিচালকের মধ্যে বাংলাদেশ আমদানিকারক একজন। ওরিয়েন্টের টোকিও গ্যারেজে '৯৯ মডেলের গাড়ি ২০০৪ মডেলের করা হয়েছে। আর আমদানিকারকের ঢাকার গ্যারেজে রডের সঙ্গে তাঁবু দিয়ে ছাউনি বানানো হয়েছে। এটা অসংখ্য ঘটনার একটি মাত্র। অনিয়মের আরেকটি ঘটনা বলি। ২২ জুলাই ২০০২ সালের ইনভয়েসে নিশান সেফিরো- ২০০০ সিসি গাড়ির সিআরএফ মূল্য ডিক্লেয়ার করেছে ৯ লাখ ২৫ হাজার ইয়েন অর্থাৎ ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৬১০ টাকা। এই শুল্কমূল্য অনুযায়ী শুল্ক প্রদান করা হয়েছে ৮৯.৪০% (১৬০০ সিসির উপরে হওয়ায়) টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ৪ লাখ ১৪ হাজার ৪৬৮ টাকা। অন্যান্য খরচ যেমন এলসি, সিএন্ডএফ বিল ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ ব্যয় ২০ হাজার টাকা ধরা হলে এই গাড়ির ক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ৮ লাখ ৯৮ হাজার ৭৮ টাকা। অথচ জাপানি ইয়েলো বুক অনুযায়ী এই গাড়ির জাপানে প্রকৃত রপ্তানি মূল্য হচ্ছে ২৩ লাখ ৭০ হাজার ইয়েন অর্থাৎ ১১ লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৪ টাকা। যদি পিএসআই সত্যায়নের পরিবর্তে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির মতো উল্লেখিত শুল্কমূল্য ইয়েলো বুকে নির্দেশিত দাম অনুযায়ী করা হতো তাহলে আমদানিকারককে ট্যাক্স দিতে হতো ৪ লাখ ৩৪ হাজার ৪৬৮ টাকার পরিবর্তে ১০ লাখ ৮১ হাজার ৯৩৩ টাকা। অর্থাৎ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এখানে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৪৬৫ টাকা। এছাড়া আন্ডার ইনভয়েসিং করায় প্রকৃত ক্রয়মূল্যের পরিবর্তে যে শুল্কমূল্য ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেই হিসেবে বাকি ৭ লাখ ২৪ হাজার ২৩৪ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারককে হুন্ডির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে এবং এভাবে অবৈধ পথে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার ছাড়া মূল্য পরিশোধ সম্ভবও নয়।

উল্লিখিত হিসাব মতে, যদি ১০০টি নিশান সেফিরো গাড়ি বাংলাদেশে বাজারজাত করে থাকে, তাহলে এই একটি

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারদর

অনেকেই গাড়ির শোরুমে যাওয়ার আগে দাম নিয়ে ভাবেন। দাম সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। গাড়ির বিভিন্ন শোরুম ঘুরে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম সম্পর্কে পাওয়া গেছে একটি ধারণা। সে ধারণা অনুযায়ী দাম ও মান মিলিয়ে এ দেশের জনপ্রিয় গাড়ি করোলা। প্রাইভেট কার, মাইক্রো এবং জিপের দাম সিসি মডেলের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম হয়। যেকোনো মডেলের গাড়ি যদি সাদা রঙের হয় তাহলে এর দাম ১০-২০ হাজার টাকা কমে যায়। এ ছাড়া অনেক গাড়ির রঙ করা হয় এখানে। সেসব গাড়ির দামও কিছু কমে যায়। গাড়ির মূল্য তালিকার বাইরে আরো কিছু টাকা দিতে হয় ক্রেতাদের। যে দামে আপনি গাড়িটি কিনবেন সে দামের সঙ্গে যোগ হবে ১.৫% ভ্যাট।

প্রাইভেট কার

গাড়ির মডেল নাম	মডেল বছর	সিসি	দাম (টাকা)
করোলা-এক্স	২০০০	১৫০০	১০ লাখ
করোলা-এক্স	২০০২	১৫০০	১১ লাখ ৮০ হাজার
করোলা-এক্স	২০০০	১৩০০	৯ লাখ ৭০-৯০ হাজার
করোলা-জি	২০০১	১৫০০	১১ লাখ
করোলা-এসই সেলুন	২০০০	১৫০০	৯ লাখ ৫০-৬০ হাজার
করোলা ফিল্ডার	২০০১	১৫০০	১১ লাখ ১০ হাজার
করোলা ফিল্ডার	২০০২	১৫০০	১১ লাখ ৭০-৮০ হাজার
র‍্যাভ-৪	২০০২	২০০০	২২ লাখ
স্টেশন ওয়াগন	২০০০	১৩০০	৬ লাখ
অ্যালিয়ন	২০০২	১৫০০	১১ লাখ ৫০ হাজার
অ্যালিয়ন	২০০৩	১৫০০	২২ লাখ ২০ হাজার
অ্যালিয়ন	২০০৪	১৫০০	১৬ লাখ
হোন্ডা-এইচআরভি	২০০১	২০০০	২১ লাখ ৫০ হাজার
প্রিমিও	২০০২-০৪	১৫০০	১৫ লাখ-১৬ লাখ ৫০ হাজার
প্লাটজ্	২০০০-০১	১০০০	৭ লাখ ৩০-৫০ হাজার
প্লাটজ্	২০০০-০১	১৫০০	৮ লাখ

মাইক্রোবাস

মডেল নাম	মডেল বছর	সিসি	দাম (টাকা)
নোয়া	২০০০	২০০০	১০ লাখ ৮০-৯০ হাজার
নোয়া-নিউশেপ	২০০২	২০০০	১৪ লাখ ৫০ হাজার
ভক্সি	২০০২	২০০০	১৩ লাখ ৮০-৯০ হাজার

জিপ

মডেল নাম	মডেল বছর	সিসি	দাম (টাকা)
প্রাডো	২০০১	২০০০	২৯ লাখ
প্রাডো	২০০৪	২০০০	৪২ লাখ ৫০ হাজার

তথ্যসূত্র : অটো গ্যালাক্সি ও হক'স বে

হাইটেক গাড়ি

ক্রিসেলার এমই ৪-১২

এমই মিন করছে মিড ইঞ্জিন। এই মডেলের গাড়িটি পারফরমেন্সের দিক দিয়ে রেকর্ড করতে চলেছে। এর ইঞ্জিন ৫৭৫০ আরপিএম-এ ৮৫০ পিএইচপি ডেলিভারি দিতে সক্ষম। এর সর্বোচ্চ গতি ধরা হয়েছে ৪০০ কিলোমিটার পার আওয়ার। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ডাবল উইশবোনস, অ্যালুমিনিয়াম কন্ট্রোল আর্মস, ইলেক্ট্রোনিক্যালি কন্ট্রোলড কম্প্রেশান এবং রিবাউন্ড টিউনিং। গাড়িটি ৪৪.৯ ইঞ্চি উঁচু, ৭৮.৭ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ১৭৮.৮ ইঞ্চি লম্বা।

মার্সিডিজ বেনজ এফ ৪০০ কার্ভিং

কার্ভিং একটি নতুন ধরনের প্রযুক্তি যা এই মডেলের গাড়িগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। গাড়িটির স্টিয়ারিং এবং ব্রেকিং সিস্টেম কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এবং এর রয়েছে সক্রিয় হাইড্রোপেনোমেটিক সাসপেনশন। এফ ৪০০ কার্ভিং মডেলে মার্সিডিজ ৩.২ লিটার ভি-৬ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এর রয়েছে ফর্মুলা ১ স্টাইল স্টিয়ারিং হুইল। এটিকে উচ্চগতিতে চলার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এর আউটফিট অত্যন্ত উঁচু মানের যা যে কারোরই চোখ ধাঁধিয়ে দিতে সক্ষম।

হোন্ডা আইএমএএস

হোন্ডার গ্যাস/ইলেক্ট্রিক ইন্টিগ্রেটেড মোটর অ্যাসিস্ট (আইএমএ) সিস্টেম বেশ জ্বালানি সাশ্রয়ী। এই মডেলের গাড়ি প্রতি লিটার ফুয়েলে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। এটি তৈরি করা হয়েছে কার্বন ফাইবার এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। আইএমএসের

আনুমানিক ওজন ১৫৪২ পাউন্ড। গাড়িটি ইলেক্ট্রোনিক্যালি কন্ট্রোলড। এর ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল এবং নেভিগেশান স্ক্রিন উপরের দিকে এবং উপরের ড্যাশ বোর্ডকে স্বচ্ছ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল বিশেষ ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে যা সচরাচর দেখা যায় না।

মিটসুবিসি আই

এটি একটি কমপেক্ট সাইজ ধারণার পরীক্ষামূলক কার। বলা যেতে পারে, পরবর্তী প্রজন্মের ছোট কারের মডেল হিসেবে এটি তৈরি করা হয়েছে। এটিই প্রথম গাড়ি যা কি না ফুয়েল সাশ্রয়ী এবং ইমোশনস টেস্টিংয়ে ৫ তারকা পেয়ে বসে আছে। এটি আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য সব ফিচার নিয়ে বাজারে আসছে। গাড়িটির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ইউরো-৪ ইমিশনস, ৯০-গ্রামস-পার-কিলোমিটার থ্রি লিটার কার ফুয়েল সাশ্রয়ী সিস্টেম, ৮৯ গ্রামস পার কিলোমিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইমিশনস ইত্যাদি।

ক্রিসলার ২০০৫ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি

চমৎকার মিনিভ্যান এটি। এর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি খুবই উন্নতমানের যা শহর এলাকায় চলাচলে উপ-যুক্ত। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : ভি-৬, উজ্জ্বল লিফটগেট লাইটবার, উডগ্রেইন ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল, ডিলাক্স সাউন্ড সিস্টেম। এছাড়া প্যাসেঞ্জারদের জন্য ড্রাইভার ইনফ্লেটেবল লাইফবার তো রয়েছেই।

মডেল থেকেই তাদের শুল্ক ফাঁকির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি ৪৭ লাখ ৪৬ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ কোটি ২৪ লাখ ২৩ হাজার ৪০০ টাকা বা ১২ লাখ ৪৮ হাজার ডলার। অন্যান্য মডেলের গাড়ি হিসাবের মধ্যে আনা হলে শুল্ক ফাঁকি ও হুন্ডির পরিমাণ কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

গাড়ি ব্যবসার সর্বত্র এখন অস্বচ্ছতা আর অনিয়ম। 'সোসাইটি ফর আরবান এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন' ২০০৩ সালে তথ্যপ্রমাণসহ বলেছিল, রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশ দূষণ করে না। তারা ২০০৫ সালে এসে তথ্যপ্রমাণ ছাড়া বলছে, রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশ দূষণ করে। এই প্রতিষ্ঠানটির ২০০৫ সালের প্রতিবেদনে জাপানের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই।

বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের গাড়ি বেশি প্রয়োজন সেটা আগে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আমরা কী শুল্ক কমিয়ে রিকন্ডিশন্ড স্টেশন ওয়াগনের দাম আড়াই লাখ টাকা নির্ধারণ করবো, নাকি ভারতীয় সিএনজি ট্যাক্সি কিনবো ৩ লাখ টাকা দিয়ে? যদিও ভারতে এই ট্যাক্সির দাম ৯৬ হাজার টাকা। নতুন মারুতি সুজুকি যেগুলোতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার থাকে না সেগুলো কিনে পরিবেশ দূষণ করবো, ৬ মাস ব্যবহার করব, নাকি দূষণমুক্ত পরিবেশের সহায়ক ৬ বছরের পুরনো জাপানি গাড়ি কিনে ১৫ বছর ব্যবহার করবো!

আমাদের মধ্যবিত্ত কম সিসির গাড়ি কিনতে চায় মূলত জ্বালানি খরচ কমের কথা চিন্তা করে। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় আছে। মাত্র ৬৬০ সিসির মিনি জিপ জাপানিজদের একটি প্রিয় গাড়ি। প্রায় প্রতিটি জাপানিজ পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় গাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই মিনি জিপ। প্রতি লিটারে চলে ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশের জন্যে যা হতে পারে একটি আদর্শ গাড়ি। এই গাড়িগুলো বাংলাদেশে আসে না। কারণ শুল্ক। ১৩০০

শুল্ক কমানোর ক্ষেত্রে বারভিডার দাবিসমূহ

* ১ থেকে ১৩৪৯ সিসির গাড়িকে একটি স্তরে রেখে সম্পূরক শুল্ক ৩০%-এর পরিবর্তে ০% করা।
* ১৩৫০ থেকে ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত একটি স্তরে রেখে বর্তমানে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৩০%-এর পরিবর্তে ১৫% করা।
* ১৬৫০ সিসি থেকে ৩০৪৯ সিসির স্তরটি বহাল রেখে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৬০% থেকে ৩০% করা।
* ৩০৫০ সিসির উর্ধ্বের রিকন্ডিশন্ড জিপ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৯০%-এর পরিবর্তে ৫০% করা।
* সিসি ক্ষমতা নির্বিশেষে অনধিক ৯ আসনবিশিষ্ট সব ধরনের মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে আরোপিত আমদানি শুল্ক ২৫%-এর পরিবর্তে সর্বনিম্ন হারে নির্ধারণপূর্বক সম্পূরক শুল্ক বর্তমানের ন্যায় ০%-এ অব্যাহত রাখা।
* অনধিক ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন সব ধরনের পিকআপ, ট্রাক ও ডেলিভারি ভ্যানের ক্ষেত্রে আরোপিত আমদানি শুল্ক ২৫%-এর পরিবর্তে বর্তমানের ন্যায় ০%-এ অব্যাহত রাখা।

সিসির একটি গাড়ির শুল্ক ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা। ৬৬০ সিসির গাড়ির ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ শুল্ক প্রযোজ্য, যা অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত। ১৫০০ সিসির একটি গাড়ির শুল্ক ৪ লাখ টাকার ওপরে। ২০০৩ সালের ১৫০০ সিসির একটি গাড়ি যেমন করোলা জি জাপান থেকে কেনা যায় ৪ থেকে ৫ লাখ টাকার মধ্যে। বাংলাদেশে আনার জাহাজ ভাড়া ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। ট্যাক্সসহ দাম পড়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা। আবার এই মানের ৫-৬ বছরের পুরনো গাড়ির জাপানে মূল্য ২ থেকে ৩ লাখ টাকা।

চার বছর নির্ধারণ না করে পাঁচ বছর নির্ধারণ করলে এবং শুল্ক কমালে গাড়ি মধ্যবিত্তের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। এতে সরকারের রাজস্ব আয় কমবে না, বাড়বে। কারণ এখন বাংলাদেশে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। আসন্ন বাজেটে নীতিমালার পরিবর্তন না হলে জাপান থেকে গাড়ি আসার পরিমাণ আরো কমে যাবে। কমে যাবে সরকারের রাজস্বও।

সরকার বারবার বলতে চেয়েছে, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দামে নতুন গাড়ি। বোঝানো হয়েছে ভারতীয় গাড়ির কথা। এটা বুঝে যারা ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা দিয়ে ভারতীয় গাড়ি কিনেছিল, তারা সবাই ভয়াবহ বিপদে পড়েছে। গাড়ির সার্ভিস তো ভালো নয়ই, কোনো রি-সেল ভ্যালুও নেই। যেখানে ৭-৮ লাখ টাকা দিয়ে কেনা একটি রিকন্ডিশন্ড জাপানি গাড়ি ৫ বছর ব্যবহার করেও ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকায় বিক্রি করা যায়।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের জীবনযাপন এমনিতেই দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। আয় বাড়ছে না, বাড়ছে ব্যয়। সেই মধ্যবিত্তের কষ্ট করে জমানো টাকা দিয়ে তাকে নিম্নমানের জিনিস কিনতে বাধ্য করার মানে হয় না।

একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনগণের কথা ভেবে। নতুন গাড়ি ব্যবসায়ীদের দিকটি দেখতে হবে। দখতে হবে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবসায়ীদের দিকটিও। কারো প্রতি বৈষম্য করাটা রাষ্ট্রীয় নীতি হতে পারে না। জাপানের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করা বাংলাদেশ ব্যবসায়ীদের বিষয়টি ভাবতে হবে গুরুত্বের সঙ্গে। কারণ দেশের অর্থনীতিতে তাদের রয়েছে অনেক অবদান। বিষয়টি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

ছবি : **সালাহউদ্দিন টিটু**